প্রজাপতির ডানা

প্রজাপতির ডানা

বাউল সাজু

তাম্রলিপি

প্রজাপতির ডানা
বাউল সাজু

গ্রন্থস্বত্ব: লেখক

প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি, ২০২৩

তাম্রলিপি: .....

প্রকাশক
এ কে এম তারিকুল ইসলাম রনি
তাম্রলিপি
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ
.....

বর্ণ বিন্যাস
তাম্রলিপি কম্পিউটার

মুদ্রণ
.....

মূল্য: .....

Projapotir Dana
By: Baul Saju
First Published: ....., by A K M Tariqul Islam Roni
Tamralipi, 38/4 Banglabayar, DhakaÑ1100.
Price: 00
ISBN : .....

উৎসর্গ

জান্নাতবাসী বাবাকে, যাকে হারিয়ে
অথৈ সাগরে হাবুডুবু খেয়ে নতুন করে বাঁচতে শিখেছি।

লেখকের বক্তব্য

বিশ্বাস নামের শব্দটি অজান্তেই ঢুকে পড়ে অবিশ্বাসের বেড়াজালে। শক্তির মানদণ্ডে পরাজিত হয় অবিশ্বাসের কালো মেঘ। সুশীতল পবনরূপী বিশ্বাসের টানা মোলায়েম স্পর্শে ফাটল ধরে কালিমায়। ধূসর হতে হতে একসময় সাদা মেঘের ভেলায় পরিণত হয়। দোলা দেয় প্রতিটি কোমল হৃদয়ে। অটল বিশ্বাসের ওপর ভর করেই লেখক সত্যকে ভালোবাসে, ভালোবাসে সততার অদৃশ্য খোলসকে। লেখক তার প্রতিটি লেখায় তুলে আনার চেষ্টা করে সমাজের চরম সত্যকে। গল্পের ছলে জীবনের কথা বলাটা তার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। এ অভ্যাস থেকে বেরিয়ে আসার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই লেখকের। "প্রজাপতির ডানা" নামের গল্পগ্রন্থে বেশ কিছু ঘটনা ঘটেছে জনসমক্ষে। অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি ব্যতীত সে ঘটনা অনেকেরই নজর কাড়েনি।

গল্প মানেই কল্পনার ডালি খুলে দেওয়া নয়। জীবনঘন কাহিনিকে দেখতে হয়। তুলে আনতে হয় চালুনি দিয়ে। লেখক চেষ্টা করেছে মাত্র। লেখকের প্রচেষ্টা তখনই সফল হবে, যখন একজন পাঠক গল্প পাঠে ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করবে কিংবা সমাজ গঠনে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখবে। লেখকের প্রত্যাশা পূরণে পাঠকের সহযোগিতা কাম্য নিরন্তর। গল্পগ্রন্থটি পুস্তকাকারে পাঠকের হাতে পৌঁছে দেবার কারিগরদের প্রতি শ্রদ্ধা থাকবে লেখকের। গল্পগ্রন্থের প্রচ্ছদ ফুটিয়ে তোলা কঠিনতর কাজ। এ কঠিন কাজটি চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছে স্নেহের ছোট ভাই সাদিত। তার প্রতি ভালোবাসা ভিন্ন দেবার কিছু নেই। প্রকাশক, প্রচ্ছদ শিল্পী, লেখক এবং কলাকুশলীদের প্রচেষ্টা সফলতার মুখ দেখবে পাঠকের ভালোবাসায়।

সূচিপত্র

সেই ধর্ষক	১১
কুৎসিত পরি	২০
প্রজাপতির ডান	২৭
কমলারা পালিয়ে বেড়ায়	৩৪
আলোড়ন	৪১
নষ্টা মেয়ে	৪৫
একজন পরাজিত মানুষের গল্প	৫০
গেদু চোরার অভিশাপ	৫৫
জমিলার স্বপ্ন	৫৯
দীপ্তের মন ভালো নেই	৬৪
বৃষ্টি হয়ে এলে	৬৯

সেই ধর্ষক

আমাদের বসার ঘরে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তিনজন মেহমান বসে আছে। মেহমানদের আপ্যায়নের ত্রুটি হচ্ছে না। তাদের শরবত দেয়া হয়েছে। নানা প্রকার ফলের সমাহার সবার সামনে। আমি না দেখেও অনুমান করতে পারছি। আমার আব্বু আর আম্মুর তুলনা নেই। অবশ্য সব সন্তানের কাছেই তার পিতা মাতা জগত সেরা। আব্বু মেহমানদের সময় দিচ্ছেন। আব্বুর উপস্থিতির কারণে চাচ্চু আর মামা আয়েশ করে আলাপ জমাতে পারছে না। তারা আব্বুর সাথে গল্পে মশগুল। এমন না যে, আব্বু গল্প করতে খুব পছন্দ করেন। মেহমানদের সঙ্গ দেয়াটাই আব্বুর প্রধান কাজ। আম্মু রান্না ঘরে শেষবারের মতো তদারকি করছেন। কোনো কিছু বাদ পড়ে গেল না তো! মাঝে মাঝেই চাপা কণ্ঠে মায়ের হুংকার শোনা যাচ্ছে বসার ঘর থেকে, যার পুরোটাই আমাকে লক্ষ করে। কারণে অকারণে আম্মু আমাকে ডেকে হয়রান হচ্ছেন। আমি তিন বার ডাকার পর এক বার সাড়া দিচ্ছি। আম্মুকে অকারণেই আমি রাগিয়ে তৃপ্তি অনুভব করি। আম্মু সেটা বেশ ভালো করেই জানে। আম্মুরা সন্তানদের মনের ভেতরের সব ষড়যন্ত্র নিমিষেই জেনে ফেলেন। কেবল আমরাই বোকার মতো আম্মু আর আব্বুকে বোকা বানানোর চেষ্টা করি। এটাই মনে হয় সন্তানের সবচেয়ে বড় বোকামি।

আমরা আজিমপুর সরকারি কলোনিতে এসে উঠেছি প্রায় এক বছর যাবত। আব্বু প্রায় উচ্চ পর্যায়ের একজন সরকারি আমলা এবং সরকারের বেশ পছন্দের তালিকায় আছেন। তিনি চেষ্টা করলে হয়তো বেইলি রোড কিংবা এলেনবাড়িতে বাসা পেয়ে যেতেন। কিন্তু আমার আর আপুর পড়াশোনার সুবিধা বিবেচনা করে এখানে এসে উঠেছেন। নতুন ঝকঝকে সরকারি কোয়ার্টার। চারদিকে প্রচুর আলো বাতাস। আমি একটু ভাবুক প্রকৃতির। মাঝে মধ্যে গোপনে দু-একটা কবিতা লিখে ফেলেছি। এখনো অবশ্য বাসার কেউ জানে না। এভাবেই আম্মু আমার উপর ক্ষেপে ব্যোম হয়ে থাকেন কারণে অকারণে। তার উপর যদি তিনি ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেন

যে, আমি কবিতা লিখছি। তা হলে আমার খবর করে ছাড়বেন। ও ভালো কথা, বাসার মেহমান আসার কারণটাই তো বলা হলো না। আমার একমাত্র আপু হিমুকে ছেলেপক্ষ আজ দেখতে এসেছে। তারাই মূলত আমাদের বসার ঘরে অপেক্ষা করছেন।

আমি-ছালছাবিল-ইমু। ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছি প্রায় বছর পেরিয়েছে। আম্মুর বরাবরই ধারণা আমি গাধা টাইপের এক ছাত্রী। আমার মাথায় বেশ বাজে ধরনের গোবরে ভর্তি। অবশ্য সেটাকে গোবর বলা যাবে না। আম্মুর ভাষায় সেটা ছাগলের লাদা। খুব বেশি রেগে গেলে বলে ফেলেন, "তোমার মাথায় আল্লাহ কেন এত মানুষের মল ভর্তি করে দিল? তার কিছুটা ছাগলের লাদা হলেও জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা যেত।" আমি অবশ্য মাঝে মধ্যে আম্মুর সাথে তর্ক জুড়ে দিই দুঃসাহস নিয়ে। দুঃসাহস বলার কারণ হলো, আম্মুর রাগ একটু বেশি। আম্মু রাগ করলেই ছেলে মানুষের মতো দরজা বন্ধ করে বসে থাকেন। এক দুই বেলা খাবার মিস দিয়ে ফেলেন। এ কারণে বাসার কেউ তার সাথে তর্ক করার সাহস পায় না। সবাই মানে এ বাসার বাকি চার সদস্য তাকে বেশ সমঝে চলে। প্রকৃতপক্ষে আমার আম্মুকে নারিকেলের সাথে বেশ তুলনা করা সম্ভব। বাইরেটা শুধুই শক্ত খোলস, ভেতরটা সুভাস আর টলটলে জলে ভরা। আসল কথাই বলা হলো না এখনো। আমাদের বাসার সদস্য সংখ্যা সাকুল্যে পাঁচজন। আমার আব্বু ছালেহ উদ্দিন প্রশাসন ক্যাডারে বেশ সুনামের সাথে চাকরি করছেন। আম্মু রাশিদা ছালেহ উদ্দিন ক্ষেত্র বিশেষে আব্বুর চেয়েও বেশি সুনাম অর্জন করেছেন একই ক্যাডারে। আম্মুর সার্টিফিকেটের নাম রাশেদা মহিউদ্দিন। তিনি নিজেকে রাশেদা ছালেহ উদ্দিন পরিচয় দিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। এটা নিয়ে অফিসে মাঝে মাঝে বেশ ঝামেলা হয়। অবশ্য আম্মু সব রকম ঝামেলাই সাহসিকতার সাথে মোকাবেলা করতে পারে।

আমাদের বাসার সবচেয়ে মেধাবী আর মারমার কাটকাট মার্কা রূপবতী আমার একমাত্র আপু মাহজাবিন হিমু। হিমুর চরিত্রের সাথে তার কোনো মিল নেই। তার মধ্যে ভাবালুতার ছিটেফোঁটাও নেই। হিমু নামটাকে বেশ অপমান করা হয়েছে। আমি প্রায়ই বিষয়টি নিয়ে আব্বুর সাথে তর্কে লিপ্ত হই। আমার প্রিয় লেখকের এক সৃষ্টিকে অপমান করার অধিকার তাদের নেই। আব্বুর সাথে তর্ক করে তৃপ্তি পাওয়া যায় না, তিনি সবকিছুতেই খুব সহজে হার স্বীকার করে নেন। আপুটা সবকিছুতেই সিরিয়াস। এ কারণেই প্রতিনিয়ত আমাকে আম্মুর কাছে বকা খেতে হচ্ছে। অথচ আমার আপু

যথারীতি নির্বিকার এ ব্যাপারে। সে কোনো ক্লাসে দ্বিতীয় হয়নি। ঢাকা মেডিকেলে ভর্তি হয়েছে মেধা তালিকায় স্থান পেয়ে। এখন ইন্টার্নি করছে। সে তুলনায় আমি নস্যি। মাঝে মাঝে মনে হয় আব্বু আমাকে একটু বেশিই আদর করেন। মায়ের গালমন্দের ভারসাম্য রক্ষা করাই উদ্দেশ্য মনে হয়। আমাদের বাসার পঞ্চম সদস্য হলো আমাদের প্রাণ ভোমরা। আমি এবং আপু তাকে খালা ডাকি। আব্বুর দূরসম্পর্কের বোন, আপুর জন্মের আগে থেকেই আছেন। আব্বুর দূরসম্পর্কের বোনকে আমরা বিবেচনাহীনভাবেই খালা সম্বোধন করছি, অথচ, বাপের বোনকে স্বাভাবিক ভাবেই ফুফু সম্বোধন করা উচিত ছিল। তিনিই মূলত আমাদের বাসার মূল অভিভাবক। তার পরামর্শেই প্রায় সবকিছু ঘটে। মুশি খালার ব্যস্ততার শেষ নেই। গত দুইদিন যাবদ তিনি বাসার সব কাজ একাই করছেন এবং তা ঝড়ের গতিতে।

আমি আমার রুমে বসে মনপ্রাণ ঢেলে সাজার চেষ্টা করছি। আমাদের বাসার পরিবেশ বেশ আনন্দমুখর। গ্রাম থেকে চাচা চাচিসহ চাচাতো ভাই-বোন এবং মামা এসেছেন। মামি এবং মামাতো ভাই-বোনরা আসতে পারেননি। তাদের স্কুল খোলা থাকার কারণে। সেই রাজশাহী থেকে একদিনের জন্য মামি আসতে চাননি। আপুকে দেখতে এসেছে আমাকে নয়, এ কথা ইতোমধ্যে বেশ কয়েকবার শোনা হয়ে গিয়েছে আম্মুর কল্যাণে। চাচি আমাকে সাজিয়ে দিতে চেয়েছিল, কিন্তু আমি নাকচ করে দিয়েছি। আসলে আম্মুকে ছাড়া আমি কারো সামনে সাজতে বসে স্বস্তিবোধ করি না। আপুকে সাজিয়ে দিইনি বলে আম্মুর বকাটা একটু বেশিই খেয়েছি। ভাগ্য ভালো ছেলেপক্ষ এসেছে। নচেৎ আম্মুর না খেয়ে থাকার অসুখটা মাথাচাড়া দিয়ে ফেলতে পারত। আমিও সুযোগ বুঝে মায়ের উপর এক হাত নিয়েছি শেষবার আমাকে কথা শোনাতে আসার সময়।

— তোমার অতি রূপসী মেয়েকে সাজতে হবে কেন? বাড়িতে মেহমান আসার অজুহাতে তোমার কালো মেয়েটি একটু সাজতে বসেছে। সেটাও তোমার সহ্য হচ্ছে না।

মায়ের মোক্ষম জায়গায় আঘাত দিয়ে ফেলেছি মজা করতে গিয়ে। আম্মু এক মুহূর্ত দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থেকে ধীরে ধীরে আমার কাছে এগিয়ে আসেন। আমি ড্রেসিংটেবিলের কাছে বসে প্রমাণ সাইজের আয়নায় তাকিয়ে দেখছি আম্মুর এগিয়ে আসা। ছলছল চোখ নিয়ে আমার মাথাটা বুকে টেনে নিয়ে বলেন,

— আম্মুকে কষ্ট দিয়ে কথা বলতে নেই মা।

আমি আম্মুর কোমর জড়িয়ে ধরে কান্না করে ফেলি।

— সরি আম্মু, আর কখনো হবে না এমনটা।

অজান্তে আমার নরম মনের আম্মুর মনে কষ্ট দিয়ে ফেলেছি। আম্মুর মন হালকা করার জন্য বলি,

— চলো আম্মু, আমরা দুজনে মিলে আপুকে সাজিয়ে দিই।

এ প্রস্তাবে আম্মু রাজি হয়ে যান। আপুর রুমে আমাকে নিয়ে আপুর পাশে বসিয়ে দুজনকে সাজাতে বসেন। প্রকৃতপক্ষে আমি মোটেই কালো নই। কিন্তু আপুর মতো জাদরেল সুন্দরী নই। হালকা প্রসাধনীর প্রলেপেই আপুকে পরির মতো লাগছে। আমাদের দুবোনকে সাজাতে বসিয়ে আম্মু রান্না ঘরের দিকে চলে যান। আমাদের দুবোনের গলায় গলায় পিরিত। আপুর কারণে মায়ের কাছে এত বকা খাই, তবু আমি আপুকে জড়িয়ে না ধরে ঘুমাতে পারি না। আমরা সাজ বাদ দিয়ে গল্পে মশগুল হয়ে পড়ি। আলোচনার মূল বিষয়বস্তু আপুকে দেখতে আসা ছেলে।

ছেলেটির নাম সাজ্জাদুল কবির। তাদের গ্রামের বাড়ি আমাদের গ্রামেই। হঠাৎ করে সাজ্জাদের আব্বুর সাথে আমার আব্বুর দেখা হয়ে যায় আব্বুর অফিসে। আব্বুর টেবিলেই তার এক কাজ ছিল। প্রথম দেখাতেই আব্বু সাজ্জাদের বাবাকে চিনতে পারেন। আব্বু তাকে কাজটিতে বেশ আন্তরিকতার সাথে সহযোগিতা করেন। দুজনের পরিবারের খোঁজ-খবর নিতে গিয়েই জানতে পারেন দুজনের ঘরেই বিবাহযোগ্য ছেলে এবং মেয়ে আছে। এরপর সাজ্জাদের বাবাই একদিন সরাসরি প্রস্তাব দিয়ে বসেন। সাজ্জাদ বুয়েট থেকে পাশ করে সম্প্রতি বেরিয়েছে। একটি ফার্মে ঢুকেছে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য। নিজেই একটি ফার্ম দেবার ইচ্ছে রয়েছে। ছবি আদান প্রদানের পর দু-পক্ষেরই পছন্দ হয়। ছেলে এবং মেয়ের অনুমতি নিয়ে আজ সাজ্জাদের বাবা মা এসেছে আপুকে দেখতে। তাদের অবশ্য গোপন ইচ্ছে রয়েছে একটা। ছেলে এবং মেয়ের একে অপরকে দেখার পর আপত্তি না থাকলে আজকেই আংটি পরানো হয়ে যাবে। এরকম একটা ইঙ্গিত ইতোমধ্যে আমার আব্বুর কাছে পেশ করা হয়েছে। আম্মুর কিঞ্চিৎ আপত্তি থাকলেও অমত করেননি।

আমি একবারের জন্যও বসার ঘরের দিকে যাইনি। আমি ভেবেছি একবারে আপুর সাথে গিয়েই সোনার টুকরো ছেলে সাজ্জাদের চেহারা মোবারক দেখব। শুনেছি ছেলে নাকি চাঁদের মতো সুন্দর। আমি শুনেই খুশি। খুশি হবার পাশাপাশি অকারণেই মনে উদয় হয়েছে। চাঁদের মতো ছেলের গায়ে আবার কলঙ্কের দাগ নেই তো? আপু নিরেট খাটি সোনা। একটু

আধটু খাদ থাকলেও উদয় হবার সুযোগ পাবে না। আপুর সাথে দারুণ মানাবে তা হলে। ছেলেকে এক ঝলক ছবিতে দেখেছি আমি। মন্দ নয়, বেশ ভালেই মনে হয়েছে। আমরা দুবোন আজ আপুর রুমে বসেই দুপুরের খাবার সেরে নিই। সবার খাবার শেষে আমি আপুকে নিয়ে বসার ঘরে প্রবেশ করি। প্রবেশ করেই আমি একটা ধাক্কা খাই। ছেলেটির চেহারা কেমন যেন আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে। আমি ভাবুক হলেও সাহসী হিসেবে আমার একটা সুনাম আছে। ছোট বেলা থেকেই আমি দস্যিপনা করে বড় হয়েছি। চমৎকার আনন্দঘন পরিবেশটি আমার কাছে মোটেই আকর্ষনীয় লাগছে না। সাজ্জাদ নামের পুরোদস্তুর ইঞ্জিনিয়ার ছেলেটিকে আমার হিংস্র জানোয়ারের মতো লাগছে। তাকে আমি কোথাও দেখেছি মনে হচ্ছে। খুব খারাপ কোনো পরিবেশে তাকে দেখেছি মনে হচ্ছে। কিন্তু কোনো ভাবেই মনে করতে পারছি না।

আমি আপুকে নিয়ে সাজ্জাদের মুখোমুখি সোফায় বসি। সাজ্জাদের চেহারা খুটিয়ে খুটিয়ে দেখতে থাকি। আমার মনে কিছু একটা উদয় হতে গিয়েও আবার কুয়াশার আড়ালে হারিয়ে যাচ্ছে। ছেলেপক্ষ আপুকে দেখেই পছন্দ করে ফেলেছে। আমি তাদের মুখের অভিব্যক্তি দেখেই বুঝতে পারছি। এই একটা ব্যাপারে মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে এগিয়ে রয়েছে। তারা অনেক কিছু বুঝতে পারে। সৃষ্টিকর্তা মেয়েদের বিশেষ ক্ষমতাটা দিয়ে দিয়েছেন। ছেলের মা গদগদ কণ্ঠে আপুর প্রশংসা করছেন। মামা সাজ্জাদের সাথে কথা বলছেন। সাজ্জাদ কোথায় পড়াশোনা করেছে এসব আরকি। মামার কথা বলার স্টাইলে মনে হচ্ছে তিনি সাজ্জাদকে বেশ পছন্দ করেছেন। আমার দীর্ঘ পর্যবেক্ষণের কারণে সাজ্জাদের কথা বলার স্টাইলে আমার স্মরণশক্তি থেকে কুয়াশার আস্তরণ কেটে যেতে থাকে। আমি নির্নিমেষ তাকিয়ে আছি সাজ্জাদের মুখের দিকে। তার কথা বলা এবং মুখের প্রতিটি কুঞ্চন আমার দৃষ্টি এড়াচ্ছে না। সাজ্জাদের সাথে চোখাচোখি হয়েছে আমার বেশ কয়েকবার। তার দৃষ্টিতে বিমূঢ়তা দেখেছি। সে হয়তো আমার দৃষ্টিকে মুগ্ধতা ধরে নিয়েছে কিংবা পর্যবেক্ষণ দৃষ্টিকে ধরতে পেরেছেন। তার চোখে আমি এ কারণেই বিমূঢ়তা দেখেছি। তার চোখের বিমূঢ়তাই আমার মনের আকাশের কুয়াশা সরিয়ে দেয়। এ দৃষ্টিটাই আমি দেখেছিলাম সেদিন। আমার সব মনে পড়ে যায়। খুটিনাটি সবকিছু। আমি হারিয়ে যেতে থাকি সুদূর অতীতে। যা আমার স্মৃতির অতলে হারিয়ে গিয়েছিল। সব আমার সামনে এসে দাঁড়ায় মুহূর্তে।

আমার বয়স তখন চার থেকে ছয়ের মাঝামাঝি। তখনো আমি স্কুলে যাওয়া শুরু করিনি। আমরা তখন দাদা বাড়িতে থাকি। আমার দাদা বাড়ি বিখ্যাত বিক্রমপুরে। আব্বু দাদার একমাত্র সন্তান হবার কারণে মাস্টার্সে থাকতেই আব্বুকে বিয়ে দিয়ে দেন। আম্মুর চাকরি হয় আমার জন্মের বেশ পরে। আব্বুর চাকরি হবার পূর্বে দাদা তাদের ঢাকায় বাসা ভাড়াসহ সংসার খরচ পাঠিয়ে দিতেন। আম্মুর পড়াশোনার ক্ষতি হতে দেননি। আব্বুর চাকরি হবার পর আম্মু আমাদের নিয়ে দাদা বাড়িতে চলে আসেন ঢাকা ছেড়ে। আমার জন্মের এক দেড় বছরের মাথায় আম্মুর চাকরি হয়ে যায়। দাদা দাদি এবং মুশি খালার কাছেই আমরা মানুষ হতে থাকি। অবশ্য খুব বেশি দিন আমাদের গ্রামে থাকা হয়নি। আব্বু আম্মু বাড়িতে না থাকার কারণে আমাদের উপর শাসনের বারটা একেবারেই ছিল না বললেই চলে। আপু গ্রামের স্কুলে প্রাথমিকে পড়েছে। দুবোন গ্রামের ছেলে মেয়েদের সাথে সারাদিন খেলায় মেতে থেকেছি।

পাশের বাড়ির রুনো, মিতা, রাকিব, সতীশ এরকম অনেকেই আমরা একসাথে খেলা করেছি। রুনোর বয়স দশ কিংবা এগারো বছর। আমার এখন সঠিক মনে নেই। তবে এটুকু মনে আছে। খেলার সময় প্রায়ই তার মা এসে তাকে বকা দিয়ে ধরে নিয়ে যেত। তখন খুব রাগ হতো সেই দুষ্টু মহিলাটার উপর। আমার আম্মু তো জানে আমরা মাঠে খেলা করি। কই আমার আম্মু তো আমাদের বকে না। তখন বুঝতে পারিনি তার মা কেন তাকে ওড়না নিয়ে চলাফেরা করতে বলত। কিন্তু রুনো মায়ের বকা মোটেই পাত্তা দিত না। মায়ের সামনে ফ্রকের উপর একটা ওড়না জড়িয়ে রাখলেও খেলার সময় সেটা খুলে রেখে দিত কিংবা কোমড়ে পেঁচিয়ে নিত। সেও আমাদের সাথে হইচই করে খেলায় অংশ নিত। তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা খুব একটা ভালো ছিল না।

রুনোর বাবা দাদুর জমি বর্গা চাষ করত। তার মা আমাদের বাড়ির যেকোনো কাজে এগিয়ে আসত নিজে থেকেই। তাই রুনো ছিল আমাদের পরিবারের একজন প্রায়। আমার চেয়ে বয়সে বড় হবার কারণে সে ছিল একাধারে আমার বন্ধু এবং অভিভাবক। আমার আপু অনেকটাই ঘরকুনো টাইপের। সে আমাদের সাথে বাড়ির ভেতরে খেলাধুলা করলেও বাড়ির বাইরে খুব একটা যেত না। ছেলে মেয়ে প্রভেদ বুঝার মতো বয়স তখনো আমার হয়নি। ছেলেদের সাথে পাল্লা দিয়ে পাখির বাসা খুঁজে বের করা ছিল আমার নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। এসব কাজে রুনো আমার পাশে থেকেছে গাইড এবং অভিভাবক হয়ে। তাই রুনো ছিল আমার আপনের চেয়ে আপন।